বিশ্ব ইসলামের মানচিত্রে ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের ভূমিকা

ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ

এক

জনসংখ্যার পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ মুসলমানের বাস এই উপমহাদেশে। এই উপমহাদেশের দুটি দেশ— পাকিস্তান ও বাংলাদেশ ঐস্লামিক হলেও উপমহাদেশে ত্রয়ের ইতিহাস ভূগোল - সংস্কৃতি এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। উপমহাদেশের বৃহত্তম দেশ— ভারতবর্ষ ঐস্লামিক দেশ না হলেও বিশ্বের মুসলমান সমাজ যে সমস্ত মুসলমান শাসক নিয়ে গর্ব করেন, ভারতবর্ষের শাসকদের বেশ কয়েকজন এর মধ্যে পড়েন। ইসলামের এতো বড়ো সাম্রাজ্য পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখা যায়নি। তাই ভারতবর্ষের ইতিহাস সমাজ - সংস্কৃতির আলোচনা প্রসঙ্গে ইসলামের আলোচনা অপরিহার্যভাবেই এসে পড়ে। ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমান শাসকবর্গ খলিফা অথবা সুলতানের ফতোয়া অধিকাংশ সময়ই মেনে চলতেন না। সম্রাট আকবর তো সুলতানের নামে ফতোয়াও পড়েননি। অর্থাৎ ভারতীয় মুসলামন শাসকবর্গ ও মুসলমান সমাজ বরাবরই একটি স্বতন্ত্র ধারায় এগিয়ে চলেছেন। এই ধারা এখনও অব্যাহত আছে। এই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের একটি বিশেষ কারণ হল মুসলমান শাসকবর্গ দীর্ঘ আটশো বছর রাজত্ব করলেও দেশের আশি ভাগ জনসাধারণ ছিলেন অমুসলমান। বিশ্বের অন্যত্র এই ঘটনা ঘটেনি। ইসলামের বিজয় রথ যেখানে পৌঁছেছিল, সে ভূখণ্ডের সিংহভাগবাসীই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এই ধারার ব্যত্যয় ঘটেছিল ভারতীয় উপমহাদেশ। এই ব্যতিক্রমী ধারার জন্য মধ্যযুগে ভারতীয় উপমহাদেশ বিশ্ব ইসলামে মানচিত্রে বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল। আর একুশ শতকের প্রবেশদ্বারে এসে ভারতীয় উপমহাদেশের মসুলমান সমাজ বিশ্ব মুসলমান সমাজের নেতৃত্ব দিতে চলেছেন? এই বিষয়ে আলোকপাত করাই এই নিবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। অন্য উদ্দেশ্য কিছু নেই, তা নয়। যা হোক মুখ্য উদ্দেশ্যের উত্তরই প্রথমে অনুসন্ধান করা যায়।

ইসলামের দেড় হাজার বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, আব্বাসীয় বংশের শাসনকালে শিল্প-সাহিত্য বিজ্ঞান - সমাজ-রাজনীতি চর্চায় ইসলাম বিশেষভাবে এগিয়ে গিয়েছিল। বিশ্ব সভ্যতার ভাণ্ডারে তার যা অবদান তা এই সময়েই সৃষ্টি হয়েছিল। সে নবম - দশম শতাব্দীর কথা। বিশ্ববন্দিত দার্শনিক চিন্তক ইবনে খলদুনের আবির্ভাব এ সময়েই ঘটেছিল। সুমেরীয় সভ্যতার উত্তরাধিকারী বাগদাদ (বর্তমানে ইরাক) এ সময়েই সভ্যতার মানচিত্রে দ্বিতীয়বার গৌরবময় স্থান করে নিয়েছিল। উদার মনোভাবাপন্ন ইসলামীয় সুফী তথা পণ্ডিতদের একটা অংশ পূর্ব গোলার্দ্ধের বিভিন্ন ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়েছিল। ইসলামের এই উৎকর্ষপর্ব অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। রাজনৈতিকভাবে বাগদাদ থেকে ইসলামের নেতৃত্ব চলে যায় তুরস্কের সুলতানের হাতে। এই তুরস্কের সুলতান ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে 'ইউরোপের রুগ্ন মানুষ' রূপে আপ্যায়িত হতে শুরু করেছিলেন। এবং প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ইসলাম জাহানের নেতৃত্ব তার হাত থেকে চিরতরে খসে পড়েছিল। অর্থাৎ তুরস্কের সুলতান আর সারা দুনিয়ার মুসলামন সমাজের অভিভাবক নন। Holy Roman Empire -এর মতন। এটি Holy -ও নয় Roman -ও নয়। ঠিক যেমন মুঘল সম্রাটের সাম্রাজ্য ১৮৫৭ সালের গোড়ার দিকে দিল্লির চৌহদ্দির সাম্রাজ্যতে রূপান্তরিত হয়েছিল। তুরস্কের সুলতানের সাম্রাজ্য তুরস্কের মধ্যেই এসে স্থিত হয়েছিল। আর সুলতানের ফতোয়া যা কিনা খালিফার প্রতিনিধির ফতোয়া হিসেবে পরিগণিত হতো, তাও অকেজো হয়েছিল কামাল আতাতুর্কের ঘোষণায়। তিনি তুরস্ককে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করেছিলেন। এবং কামাল আতাতুর্কের তুরস্কই আধুনিক পৃথিবীর প্রথম আধুনিক মুসলিম রাষ্ট্র। মুসলমি রাষ্ট্রের আধুনিকতা ইতিহাসে কামাল আতাতুর্ক এখনো পথিকৃত হিসেবে নন্দিত হন। দুঃখের বিষয় কামাল আতাতুর্কের সমতুল্য কোনো মুসলমান শাসক আমরা আর পাইনি। চিন্তা, কর্মে তিনি এতটাই আধুনিক ছিলেন যে, ঔপনিবেশিক দেশসমূহের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের নিকট তিনি ছিলেন আদর্শ এক রাষ্ট্রনায়ক। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে এও বলতে হচ্ছে, যে, কোন মুসলামান রাষ্ট্রই তাঁর আধুনিকতার পথকে পাথেয় করেনি। ইসলাম দুনিয়ার এ এক বৃহত্তম ট্রাজেডিও বটে। ঐস্লামিক দুনিয়ার এই প্রেক্ষাপটে আধুনিক ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমান সমাজের অবস্থান নিরূপণ করবো।

দুই

আধুনিক বিশ্ব ইসলামের মানচিত্রে ভারতীয় মুসলমান সমাজের অবস্থান ও ভূমিকা জানার জন্য আমাদেরকে ভারতীয় মুসলমান সমাজের নৃগোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্য ও মনোভূমির চিত্রটি পরখ করা প্রয়োজন। তা না হলে ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমান সমাজের স্বতন্ত্র ধারার সূত্র খুজে পাওয়া যাবে না। তাই নৃগোষ্ঠীগত কাঠামোর প্রশ্নেই প্রথম আসছি।

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমান সমাজ প্রকৃতপক্ষে বিপরীত ধর্মী নৃগোষ্ঠীর সমষ্টি। ইরানী, তুরানী, আরবীয়, মঙ্গোলিয়, আফগান, আবিসিনীয় বহিরাগতরা এদেশে শাসন করেছেন বা শাসন ব্যবস্থা চালিয়েছেন এইসব বহিরাগত মুসলমানের সংখ্যা খুব সামান্য ছিল। এরা ছাড়াও ছিল ধর্মান্তরিত মুসলমান সমাজ। এদের সিংহভাগই এ দেশের অন্ত্যজ সমাজভুক্ত ছিলেন। এই অন্ত্যজ ও অভিজাত ধর্মান্তরিত মুসলামান সমাজ তাঁদের হিন্দু, বৌদ্ধ ও লোকায়ত ঐতিহ্য নিয়েই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ইরানীরা তাঁদের পূর্বতন দরবারী সংস্কৃতি ও আরবীয়রা তাঁদের আরব্য রজনীয় নাচগান তুকতাকের ঐতিহ্য নিয়েই ভারতে এসেছিলেন। প্রাক্ ইসলামীয় আরবীয় সংস্কৃতি আরব ভূখণ্ড থেকে ভারতীয় উপমহাদেশেই ইসলামোত্তর যুগে বিশেষভাবে শেকড় প্রসারিত করেছিল। কারণ ভারতীয় মাটি বহু জাতীয় সংস্কৃতিতে বরাবরই গ্রহণ করেছে। আর এই কারণেই আরব্য রজনীয় কাহিনীভিত্তিক দূরদর্শন ধারাবাহিক আলিফ - লায়লা ভারতীয় বা উপমহাদেশে বর্হিভূত কোনো ঐস্লামিক দেশেই এই বিষয় নিয়ে ধারাবাহিক করার প্রয়োজন অথবা দুঃসাহস কোনোটিই দেখায়নি। আবার প্রাক ইসলামীয় ইরানী সমাজের দরবারী সংস্কৃতি ঐতিহ্য বাঈজী নাচ বা বাঈজীদের মুজরো ও মুসায়ারা; এবং কাওয়ালী, মোহফিল, তেওফাওয়ালীর নাচ প্রভৃতি তো ইরানী ও ভারতীয় ঐতিহ্যের মিত্র চেহারা। এসব কিন্তু ইসলামীয় ইরান থেকে নির্বাসিত। ওমর খৈয়ামের দেশ থেকে খৈয়াম নিজে বিতাড়িত হলেও ভারত কিন্তু তাঁকে আশ্রয় দিয়েছে। ফার্সী সাহিত্যের দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ভাবনা আমাদের দেরেশ সাহিত্য বিশেষতঃ বাংলা ও উর্দু সাহিত্যকে বিপুলভাবে সমৃদ্ধ করেছে। আমরা আলোচনার পুনরায় ফিরে আসবো। তাই যে আলোচনা শুরু করেছিলাম সেই বৃত্তে আবার ফিরে যাচ্ছি।

তিন

ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা সাধারণভাবে ভারতীয় উপমহাদেশে একটি নতুন পরিবেশের জন্ম দিয়েছিল। আদি পর্বে ভারতীয় হিন্দু সমাজ এই ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় বিশেষ উপকৃত হয়েছিল এবং এই সূত্রেই একটি সীমাবদ্ধ নবজাগরণও ঘটেছিল দেশে। এক শতাব্দী পরে হলেও মুসলমান সমাজেও একটি সীমাবদ্ধ নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল। পৃথিবীর আর কোনো ভূখণ্ডের মুসলমান সমাজ এইভাবে উপনিবেশিক তথা ইংরেজ শাসনের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে আসেনি। অবশ্য একথাও সত্য যে, ওয়াহাবী আন্দোলন ভারতীয় মুসলামান সমাজে আধুনিকতার প্রসার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। এ সত্ত্বেও বিপুল সংখ্যক উপমহাদেশের মুসলমান যুবকরা পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করেছিল। ধর্মীয় গোঁড়ামি সত্ত্বেও এই যুবকরাই পাকিস্তান এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছিল। হিন্দু, খ্রীস্টান, বৌদ্ধ ও পার্শী সংস্কৃতির সংস্পর্শে থাকার ফলে উপমহাদেশের মুসলমান সমাজের মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত সমাজ একটি উদারনৈতিক আবহাওয়া তৈরি করতে সমর্থ হয়েছিল। ভারতীয় উপমহাদেশের মতো অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ হার্ভার্ডের ডিগ্রিধারী মুসলমান আছেন, পৃথিবীর কোথাও তা নেই।

উপমহাদেশের মাটি ও ঐতিহ্যের মিশ্রণে ভারতীয় মুসলমান সমাজও নিজেদেরকে গড়ে তুলেছেন। এই জন্যই আমরা পাকিস্তান ও বাংলাদেশের, প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী নেত্রী হিসেবে মুসলমান মহিলাদের পাই। ভারতবর্ষের বহু মুসলিম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রী, রাজ্যপাল, রাজ্যসভার উপাধ্যক্ষ হয়েছেন এবং হচ্ছেন। এই উপমহাদেশ ব্যতীত পৃথিবীর অন্যত্র মুসলমান মহিলারা এই রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করেন না। এটি ভারতীয় উদার ঐতিহ্যের ফলেই সম্ভব হয়েছে— ইরান, মিশর, ইরাকে এসব সম্ভব হয়নি। একুশ শতকে উপমহাদেশের মুসলমান নারীসমাজ বিশ্ব মুসলমান নারীসমাজের যে নেতৃত্ব দেবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ পৃথিবীর প্রথম মুসলামন মহিলা রাষ্ট্রপ্রধান সুলতানা রাজিযা এই উপমহাদেশেই জন্মেছিলেন।

সাহিত্য - শিল্প - সংস্কৃতি - বিজ্ঞান প্রযুক্তি চর্চার ক্ষেত্রে উপমহাদেশের মুসলমান সমাজ পৃথিবীর মুসলমান সমাজ থেকে অনেক এগিয়ে আছেন। মিশরের নেগুইব মেহফৌজ একমাত্র ব্যতিক্রম। ইনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। কিন্তু যখন পুরস্কার পান, তখন মিশনের মেহফৌজ চর্চা নিষিদ্ধ ছিল। মেহফৌজ এবং নাজিম হিককত ছাড়া আর কোনো বিশ্বমানের মুসলমান সাহিত্যিক বিশ্বের মুসলিম দেশে নেই। কিন্তু উপমহাদেশের বহুম মুসলমান লেখকই বিশ্বখ্যাত। সলমন রুশদী, ফয়েজ আহমদ ফয়েজ, আবুলফজল, হাম্‌দিবে, খাজা মহম্মদ আব্বাস, তসলিমা নাসরীন, আবু সৈয়দ আয়ুব ভারতীয় পরিবেশেই তৈরি হন, আরব বা ইরানের আবহাওয়ায় নয়। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, আবুলবাশার প্রমুখ লেখক ইসলামিক দেশে বসে লিখতে পারতেন কি? বোধকরি পারতেন না। উপমহাদেশের চলচ্চিত্র জগতে মুসলমান মহিলা - পুরুষদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি নিঃসন্দেহে প্রশংসাযোগ্য। ভারতীয় হিন্দি চলচ্চিত্রের কলা কুশলীদের একটি শক্তিশালী অংশই মুসলামান। মীনাকুমারী, দিলীপকুমার, সায়রাবানু, ওয়াদিহা রহমান থেকে শুরু করে আমীর খান, আমজাদ খান, শাহরুখ খান, শাহবাজ খান, জীনতামন প্রমুখের মতন জনপ্রিয় শিল্পি পৃথিবীর আর কোনো মুসলমান দেশে নেই। বরং বলা যেতে পারে যে, ভারতীয় হিন্দি - সিনেমা বিশ্বের সর্বত্রই ভীষণ জনপ্রিয়। ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ঐস্লামিক দেশদ্বয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগভাবে উন্নতি করলেও শিল্প - সাহিত্য - সংস্কৃতিতে এরা উপমহাদেশের মুসলমান সমাজ থেকে অনেক পিছিয়ে আছেন। এখন পর্যন্ত যে দুজন মুসলমান নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তাঁর একজন এই উপমহাদেশের।

উপমহাদেশের ধ্রুপদী সংগীত, যন্ত্রসংগীত, আধুনিক সংগীতের জগতে মুসলমান গাইয়েদের উজ্জ্বল ভূমিকার কথা সুবিদিত। আলাউদ্দীন খান, আমজাদ খান, আলী আকবর খান, বেগম আখতার, জাকির হোসেন প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। আর ছবি আঁকিয়ে মকবুল ফিদা হুসেনের নাম তো বিশ্বজোড়া। হুসেনের এই প্রতিভা কোনো ঐস্লামিক দেশের আবহাওয়ায় বিকশিত হতে পারতো কি? বোধ হয় নয়। হুসেনের সমতুল্য কোনো ছবি আঁকিয়ে মুসলমান বিশ্বে আছে কি? না থাকার একটাই কারণ। সেটি হল উদারনৈতিক পরিবেশ।

বিশ্বক্রিকেটের ইতিহাসে উপমহাদেশের গৌরবজনক ভূমিকার কথা সর্বজনবিদিত। আজহারউদ্দিন থেকে ইমরান খানের নাম কে না জানে? অথচ উপমহাদেশের বাইরে মুসলিম বিশ্বের কোনো দেশের একজন ক্রিকেটারের নামও কেউ জানে না বা শোনেনি। উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, উপমহাদেশের ঐতিহ্য ও উদারনৈতিক পরিবেশের ফলেই উপমহাদেশের মুসলমান সমাজ অবশিষ্ট বিশ্বের মুসলমানদের চেয়ে সমস্ত ক্ষেত্রেই অগ্রণী স্তরে অবস্থান করেছেন এবং একুশ শতকের মুসলমান বিশ্বের নেতৃত্ব দেবেন উপমহাদেশের মুসলমান সমাজই। ইসলামের সংস্কার আন্দোলন এবং নবজাগরণ ও এই ভূখণ্ড থেকেই শুরু হবে বলে আশা করা যেতে পারে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ শ্রীমতী রুমা ঘোষ শক্তিপদ মৈত্র, বৈশালী সরকার, এম আকছার আলী, অধ্যাপক জাফর ওয়াদেব, ফজমুল হমান